সাংবিধানিক সংস্কার ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

ক. সাধারণ আলোচনাঃ

১.১ উইকিপিডিয়ার ভাষ্যঃ A constitution is the fundamental set of principles on established laws that govern a nation, organization or other entity. It outlines how power is distributed, defines the rights of citizens and acts as the supreme law that ordinary laws must follow.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালনায় সংবিধানই সর্বোচ্চ আইন ও বিধি বিধান। ইহাই জনগণের অধিকারকে সংজ্ঞায়িত করে এবং ক্ষমতার বন্টন এমনভাবে নির্দেশ করে তাকে সমুন্নত রাখতে দেশের সকল আইন কানুন সংবিধানের নীতিমালা মানতে বাধ্য থাকে।

১.২ সংবিধান কোন অলঙ্ঘনীয় বা অপরিবর্তনীয় দলিল নয়।

সংবিধান কোন অপরিবর্তনীয় আইন বা বিধি বিধান নয়। তবে সে সকল পরিবর্তন সংসদ সদস্যগণের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আনতে হবে। রেফারেন্ডাম বা গণভোটের মাধ্যমেও সংবিধানে সংশোধন আনা হয়ে থাকে। কারণ গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৭২ সনে সত্তুরের ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা ও দেশ পরিচালনার ঘোষণা অনুযায়ী লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) এর অধীনে নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকার করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতার বিপক্ষে ভোট দেওয়া শতকরা ২৭জন বাদে সকল বাঙালী একতাবদ্ধ হয়ে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে মরণপণ লড়াই করে দেশ স্বাধীন করে। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যে অহেতুক বাক বিতন্ডা দেশের রাজনীতিকে এক চরম অস্বস্তিতে রাখছে তার সমাধান কিন্তু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বিকেল সাড়ে তিনটার কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণার মধ্যেই নিহিত।

তিনি বলেছিলেন, “I Major Ziaur Rahman declare the independence of Bangladesh on behalf of our great leader Shiekh Mujibur Rahman.”

১.৩ বায়াত্তরের সংবিধানের ভিত্তি ও স্বাধীনতা ঘোষণা বিতর্ক

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ ছয় দফায় নিহিত স্বাধীনতার ম্যান্ডেট এর ভিত্তিতে একটি গণপরিষদ গঠিত হয়। দেশ বিদেশে খ্যাত আইন বিশারদ ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে পয়ত্রিশজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পোড় খাওয়া রাজনীতিক ও আইন পারদর্শীগণ বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় দিক নির্দেশনায় একটি সংবিধান রচনা করেন। ১৮ই কার্তিক ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ তথা ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ তারিখে গণপরিষদে পাসকৃত বাংলাদেশের সংবিধানটি দেশে বিদেশে সাধুবাদ পেলেও আজ অবধি তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেকবারই এর কাটছাট ও সংশোধন করা হয়েছে। অবশ্য গণভোটের মাধ্যমেও সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে।

১.৪ THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

মজার ব্যাপার হল এই যে বায়াত্তরের সংবিধান নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও ১৯৭১ সনের ১০ এপ্রিল জারি করা THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE নিয়ে কেউ তেমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। বরং ঐ প্রক্লেমেশনের উপক্রমণিকাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় “ We, the elected representatives of Bangladesh, as honour-bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme, duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and having had mutual consultation, and in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice” ইহাতে বর্ণিত তিনটি মুলনীতি তথা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায্যতা বিতর্কে লিপ্ত সকল মহলের কাছেই অবাধে গ্রহণযোগ্য বলে দৃশ্যমান। বাংলাদেশের সংবিধানেও তিনটি মুলনীতি বিভিন্ন প্রসঙ্গে দীপ্তমান রয়েছে।

খ. <u>গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ কয়েকটি সংশোধনীয় প্রয়োজনীয়তা</u>

২.১ দেশের অভাব অভিযোগ, অনাচার এমনকি সকল আমলেই স্বৈরশাসনের অপবাদের জন্য সংবিধানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর একটি প্রবণতা বিদ্যমান। সরকার প্রধানগণ সংবিধানকে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও চিরায়ত করার জন্য যে প্রচেষ্টা করে থাকেন তা বন্ধ করে ভারসাম্য আনয়নের সদিচ্ছা কোন আমলেই হালে পানি পায়নি। সংবিধানে কিছু সংশোধন, রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য এবং রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রায়ন সম্পর্কে কিছু বলাই আজকের বক্তব্যের একটি মূল কথা। অন্যটি হলো প্রশাসনিক সংস্কারে জনকল্যাণ বৃদ্ধি করার সুপারিশ।

২.২ নির্বাচন পদ্ধতি ও সরকার প্রধানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা

সত্তুরের নির্বাচন আর ১৯৯১ সনে অনুষ্ঠিত বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দিনের কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত দুটো ছাড়া অন্য কোন নির্বাচনই সকল মহলে গ্রহনযোগ্যতা পায়নি। কেয়ারটেকার ব্যবস্থাকেও যে দুমড়ে মুচড়ে অকার্যকর করা যায় তার একটি মোক্ষম প্রমাণ ২০০৬ সনের প্রস্তাবিত নির্বাচন বাতিল হওয়া এবং দু'বছর মেয়াদী এক এগারোর সরকার প্রতিষ্ঠা। বিরাজনীতিকরণের প্রচেষ্টা তখন জোরে শোরেই করা হয়। সে সময় RATS PLUS TWO (রাজ্জাক, আমু, তোফায়েল, সুরঞ্জিৎ প্লাস শেখ সেলিম ও জলিল) মাধ্যমে সংস্কারের নামে আওয়ামী লীগে শেখ হাসিনার ক্ষমতাকে খর্ব করার একটি জোরালো প্রচেষ্টা হয়। তাকে দেশে আসতে প্রবল বাধা সৃষ্টি করা হয়। জেদ করে দেশে আসার পর শেখ হাসিনাকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়। তবে তাকে মাইনাস করার অপচেষ্টা জনাব জিল্লুর রহমান ও সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ব্যর্থ করে দেন। অপরদিকে মান্নান ভূইঞার নেতৃত্বের সংশোধনবাদী মহলটি (এখনও কয়েকজন বিরাজমান) বিরাজনীতিকরণের অংশ হিসেবেই বেগম খালেদা জিয়াকে দেশত্যাগে প্রচন্ড চাপ দিতে থাকেন। আপোষহীন নেত্রী জীবন মরণে বাংলাদেশ সংকল্পে অটুট থাকেন। বিরাজনীতিকরণের অপচেষ্টা হিসেবেই রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া এবং দেশত্যাগের মুছলেকা নিতে জনাব তারেক রহমানের উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়। সমন্বিত সমান্তরালভাবে

এবং সরকারের আশীর্বাদে উপরে বর্ণিত দুটো প্রচেষ্টাকে 'মাইনাস টু' ফর্মুলা নামে কুখ্যাতি দেওয়া হয়। তবে উভয় নেত্রীই দৃঢ়ভাবে সংকট কাটিয়ে রাজনীতির পথ খোলা রাখেন।

২.৩ সংসদ নির্বাচনে সংস্কার প্রস্তাব

প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতিতে উইনার টেইক অল তথা বিজয়ী দলকেই বিশেষ করে নির্বাহী প্রশাসনে এবং তৎমাধ্যমে জুডিশিয়ারিতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বলয় সৃষ্টি করে কর্তৃত্ব খাটাতে পারেন। সংসদীয় এলাকাভিত্তিক জয় পরাজয় নির্ধারিত হয় বলে মোট ভোট প্রাপ্তির অনুপাতে সংসদে সীটের সংখ্যায় ব্যাপক অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। ১৯৯১ সনের নির্বাচনে বিএনপি ১,০৫,০৭,৫৪৯ (এক কোটি পাঁচ লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত উনপঞ্চাশ) ভোট পেয়ে ১৪০ টি সংসদীয় আসন লাভ করে। অপরদিকে আওয়ামী লীগ ১,০২,৫৯,৮৬৬ (এক কোটি দুই লক্ষ উনষাট হাজার আটশত ছেষট্টি) ভোট পেয়ে ৮৮টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ শতকরা ১২% ভোট কম পেয়ে শতকরা ২১ ভাগ আসন কম পায়। ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত পয়লা অক্টোবরের নির্বাচনী ফলাফলে একেকটি সংসদীয় এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত সংসদে মারাত্মক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এতে বিএনপি মোট দুই কোটি আটাশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শত আটাত্তর ভোট পেয়ে ১৯৩টি আসন লাভ করে। আর প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মোট দুই কোটি তেইশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার পাঁচশত ষোলো ভোট পেয়ে ৬২টি আসন লাভ করে। দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত তিরাশি ভোট অর্থাৎ শতকরা ০.৮০ ভাগ ভোট কম পেয়ে আওয়ামী লীগ শতককরা প্রায় ২৬ ভাগ তথা ১৩১টি আসন কম পায়। আবার ২০০৮ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শতকরা ৪৮% ভোট পেয়ে শতকরা ৭৭ ভাগ আসন দখল করে; অথচ বিএনপি শতকরা ৩৩ ভাগ ভোট পেয়ে শতকরা মাত্র ১৬ ভাগ আসন জিতে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সংসদীয় কমিটিসহ প্রজাতন্ত্রের চাকরী বাকরী, কেনাকাটা এবং উন্নয়ন অর্থ বরাদ্দে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারেন সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।

২.৪ উচ্চকক্ষ সৃষ্টির বিধান

এই অসংগতি শোধরানোর জন্য অনেক জ্ঞানীজন আনুপাতিক ভোটের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু নেপাল, ইটালী এবং অন্য আরও অনেক দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে আনুপাতিক ভোটের হারের ব্যবস্থা

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তথা অস্থিরতার একটি বড় উপাদান। তা ছাড়া এ পদ্ধতিতে দলীয় ক্ষমতা অর্থাৎ দল ও সরকারপ্রধানের হাতে আরও নিরঙ্কুশ হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এ কারণে প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশের মতো বাংলাদেশেও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট একটি সংসদ থাকার পক্ষে জোরালো ও যুক্তিসংগত পরামর্শ দিয়েছেন সংবিধান ও সংসদ বিশেষজ্ঞগণ। ৩০০ সংসদ সদস্য নিম্নকক্ষ সংসদীয় এলাকা ভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। আর ১০০ বা সকল মহলের সর্বসম্মত অন্য কোন সংখ্যা সদস্য বিশিষ্ট উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষে দলভিত্তিক প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে উচ্চকক্ষ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন। উচ্চ কক্ষের ব্যবস্থা একদিকে যেমন ভোটে অনীহা অথচ বিজ্ঞজনকে সংসদীয় গণতন্ত্রে সম্পৃক্ত করা যাবে অন্য দিকে তেমনি উপযুক্ত ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উচ্চকক্ষে অর্থপূর্ণ রক্ষাকবচ হিসেবেও কাজ করতে পারবে। নিম্নকক্ষের ব্রুট মেজরিটিকে প্রশমন বা মোলায়েম করার এটি একটি কার্যকর উপায় হতে পারে।

২.৫ সংবিধানের ৭০ ধারার স্বেচ্ছাচারিতা

স্থিতিশীলতার নামে পার্টি হুইপের গিলোটিন সংসদে কল্যাণমূখী ভিন্নমত প্রবাহের পথ রুদ্ধ করে রাখে। আবার ইচ্ছেমত দল বদল করে সংসদকে অকার্যকার করে দেবার ব্যবস্থাও কোন উত্তম পন্থা নয়। মাঝামাঝি অবস্থানে তিনটি বিষয় ছাড়া যথা সংবিধান সংশোধন, অনাস্থা প্রস্তাব এবং অর্থবিল ছাড়া সকল বিষয়ে পার্টি হুইপের বিপরীতে ভোট দেয়ার বিধান রাখা যেতে পারে। অবশ্যই এ তিনটি বিষয়েও দলের অবস্থানের বিপরীতে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ রাখা যেতেই পারে। বিধি নিষেধ কেবল ভোট দানের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। তবে এক প্রতীকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করলে সংসদে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যেতে হবে।

২.৬ ফ্লোর ক্রসিং

যদি একটি রাজনৈতিক দলের প্রতীকে নিবন্ধিত সংসদ সদস্যগণের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ঐ দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্বে অনাস্থা প্রকাশ করে স্পীকার সমীপে তা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে ঐ গ্রুপের সদস্যগণ তাদের সংসদীয় আসন অক্ষুণ্ন রেখে আলাদা দল বা গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। তবে তারা যদি মূল দলের

নাম ও প্রতীকের দাবীদার হন অথবা অন্য কোন দলের সাথে সংযুক্ত হতে চান,তাহলে মূল দলীয় নেতৃত্বের সম্মতি ছাড়া তা করতে দেওয়া সমীচিন হবে না।

২.৭ একজন সংসদ সদস্য অনুরাগ বিরাগের উর্ধ্বে উঠে প্রজাতন্ত্রের কল্যাণের জন্য প্রস্তাবিত অথবা নিজ উদ্যোগে প্রধানত আইন প্রণয়নের কাজে সম্পৃক্ত থাকেন। তিনি নিজের বা পরিবারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আইন প্রণয়নে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করবেন যাতে কোন পক্ষপাতিত্বেও অভিযোগ উঠার সুযোগ না থাকে।

২.৮ একজন সংসদ সদস্য স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক অথবা উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়বেন না।

২.৯ ডেপুটি স্পীকার ও পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ার

অতি অবশ্যই ওয়েস্টমিনিস্টার সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ডেপুটি স্পীকার (দুটো পদ থাকলে এক নম্বর পদ) ও পাবলিক অ্যাকউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানের পদ বিরোধী দলের জন্য সংরক্ষণ করে ছেড়ে দিতে হবে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারপার্সন ও সদস্যপদে বিরোধী দলকে তাদের সদস্যপদেও সংখ্যায় প্রাপ্যতার বেশী সুযোগ দিলে গণতন্ত্রের মহিমা বৃদ্ধি পাবে।

২.১০ সংবিধানের ১৪৭ ধারার ৪ উপধারায় একটি অতিরিক্ত (e) বিধান সংযুক্ত করে সংসদ সদস্যদের নাম সন্নিবেশিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ সংসদ সদস্যগণকে লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের অযোগ্য করা যেতে পারে।

২.১১ সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা, উপনেতা ও হুইপগণকে যথাযোগ্য মর্যদা দেওয়ার ঐতিহ্য গড়তে হবে। তবে বিরোধী দলকেও দায়িত্ববান হতে হবে।

গ. রাষ্ট্রপতি

৩.১ নির্বাচন ও ক্ষমতার পরিধি

বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একচ্ছত্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অন্যতম প্রধান কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে ন্যস্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতার অপ্রতুলতা এবং সেই সীমিত ক্ষমতা ব্যবহারেও রাষ্ট্রপতির অনীহা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যারা

ভোট দেন সে সংখ্যা মাত্র ৩০০ জন সংসদ সদস্য। ট্রেজারী বেঞ্চের নেতা তথা প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত ব্যক্তিই রাষ্ট্রপতি হয়ে থাকেন (ধারা ৪৮)। আবার সংবিধানের ৫২ নং ধারায় সরকারী দল তথা সরকার প্রধানের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করার নোটিশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণই জারী করতে পারেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কার্যকাল ও দায়িত্ব পালনের পরিধি বলয় সরকারপ্রধানের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভরশীল।

এহেন অবস্থার উন্নতি করে সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষমতার কিছুটা হলেও ভারসাম্য আনার স্বার্থে (১) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সরাসরি ভোটের মাধ্যমে অথবা (২) একটি সম্প্রসারিত ইলেক্টোরেল কলেজের মাধ্যমে অর্থাৎ সংসদ সদস্যগণ ছাড়াও উচ্চকক্ষের সদস্যগণ, সকল কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়র ও কমিশনারগণ, জেলা কাউন্সিলরের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এবং উপজেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সমাহারে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এর ফলে রাষ্ট্রপতিকে সরকার প্রধানের আজ্ঞাবহ থাকা থেকে মুক্ত করা হবে।

৩.২ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি

সংবিধানের ৪৮ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙে দেওয়া এবং মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা এবং গণভোটের আয়োজন করা যেতে পারে। তবে এটি আকাশকুসুম কল্পনা এবং বাস্তবে একনায়কতন্ত্রের জন্ম দিতে পারে। এ সম্পর্কে হাজার বার চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শ করে তবেই অগ্রসর হতে হবে।

সকল সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যাস্ত করা যেতে পারে। তরে তিনি সেই নিয়োগ দেওয়ার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার মতামত সম্পর্কে পরামর্শ নিতে পারেন যদিও সিদ্ধান্ত তার কাছেই ন্যস্ত থাকা সমীচিন হবে।

৩.৩ নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার

সব দলের সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে। তবে ২০১৪ সনের নির্বাচন সম্পর্কে কিছু বাড়তি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। দেশে গোলযোগ অরাজকতা। দোকানে, বাসে আগুন, মানুষ মরছে। আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও প্রধান বিরোধী দল বিএনটি (+ জামায়াত) এর

মধ্যে জলিল-মান্নান ভূইঞার আলোচনা কয়েক দফা নিষ্ফল। জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ ও ওআইসি মধ্যস্থতা করছে। কূটনৈতিক মহল তৎপর। এর মধ্যে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনকালীন সরকারের একটি মৌলিক প্রস্তাব দিলেন ঃ দশজনের সরকার, পাঁচজন আওয়ামী লীগের এবং পাঁচজন বিএনপির। অর্থ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিএনপির হাতে থাকবে। কিন্তু হয়েও হলো না। বিরোধী জোট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বসে। নির্বাচন হল বটে। ১৫৩টি সংসদীয় আসনে যে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম জমা দেননি দলের নির্বাচনী কমিটি সে খবরও রাখেননি।

আমি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হলেও রাজনীতি সচেতন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক। বিভিন্ন সূত্রের তথ্য এবং আমার মূল্যায়নে আমি নিশ্চিত ছিলাম- ২০১৪ সনের নির্বাচনে বিএনপি জোট জয়লাভ করবে অথবা নিদেনপক্ষে খুব শক্তিমান বিরোধী দল হয়ে সংসদে প্রবেশ করবে। দলীয় সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। এই প্রেক্ষিতে আমার বলতে কোন দ্বিধা নেই যে একটি শক্তিমান ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীনে উপযুক্ত রক্ষাকবচে পৃথিবীর অন্যান্য গণতন্ত্রের মতই দলীয় সরকারের অধীনেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিৎ এবং তা নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্টভাবেই সম্পন্ন করা সম্ভব। কেয়ারটেকার সরকার রাজনীতির উপর অনাস্থাজনিত আমলাতান্ত্রিক একটি অগ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। নির্বাচনের ৯০ দিন আগে দলীয় সরকারের পরিধি হ্রাস করে রুটিন ওয়ার্কের নির্বাচনী সরকারে রূপান্তর ঘটতে পারে। সংসদ সদস্যগণের ক্ষমতা ও প্রটোকল সে সময় স্থগিত থাকতে পারে। এনইসি সে সময় কার্যকর থাকবে না আর যথারীতি প্রশাসনিক ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে চলে যাবে।

৩.৪ সংবিধানের ৭৭নং ধারা অনুসরণ করে প্রথমবারের মত উপযুক্ত কর্তৃত্ব সম্পন্ন ন্যায়পাল নিয়োগ দিলে গণতান্ত্রিক চেক ব্যালেন্স রক্ষা করার পক্ষে শক্তিযোগ হবে।

৩.৫ নির্বাচন ব্যবস্থার আরও কিছু সংস্কার

আরপিও তে একটি রাজনৈতিক সদস্যভূক্তি তিন বছর না গেলে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া যাবে না বলে যে বিধান আছে তা পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। দলীয় মনোনয়ন স্থানীয় ইউনিটের (উপজেলা এবং /

অথবা জেলা) সুপারিশ অনুযায়ী দেওয়ার বিধান করা যেতে পারে। নির্বাচনী খরচে লাগাম টানা খুবই জরুরী। প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া খরচ সীমার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও সরকারী কোষাগার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে নির্বাচনী খরচের বিষয়টি অডিটের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে আসবে। তবে নির্বাচনে প্রার্থী হতে যে জামানতের টাকা দিতে হয় তা খুবই কম হওয়ার সুপারিশ রইল। সংসদীয় প্রার্থী চয়নে মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য করে দিতে হবে। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে একটি রাজনৈতিক দলের কার্যনির্বাহীগণের অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ নারী হতে হবে এবং তিন চারটি নির্বাচনের পর এ অনুপাত ফিফটি-ফিফটি করা যেতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের স্বাভাবিক মর্যাদা সৃষ্টি ও সংরক্ষণে কোটা (সাধারণতঃ দুর্বলদের জন্য প্রচলিত) সিস্টেম বিলোপের সুপারিশ করি। তাছাড়া বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মহারথীদের হিসাব কিতাব তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ মাধ্যমে গৃহস্থালী কাজকে সমষ্টিক অর্থনীতির একটি অনুপাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সমীচিন হবে।

৩.৬ ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা

স্পর্শকাতর ভূ রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশে প্রাদেশিক ইউনিট সৃষ্টি আপাততঃ সম্ভব নাও হতে পারে। উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ সনের আগষ্টে বৃটিশ বিতাড়ন কালে ভারত ও পাকিস্তান ছাড়াও গ্রেটার বেঙ্গল নামে তৃতীয় একটি স্বাধীন দেশের সম্ভবনা (ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) সোহরাওয়ার্দী-কিরণশংকর-শরৎ বসু ফর্মুলা মহাত্মা গান্ধী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আলাদা আলাদা সমর্থন প্রত্যাহারের ফলে ভেস্তে যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও বেঙ্গলের সীমানা নির্ধারণী Radcliffe Commission প্যামেলা মাউন্টবেটেনের মাধ্যমে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর চাপ, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ দেখার জন্য কমিশন সদস্য বিচারপতি আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরামের এ বিষয়ে ন্যূনতমদ জ্ঞান ও আগ্রহের অভাব এবং প্রবল প্রতাপান্বিত কংগ্রেস নেতা শ্যামা প্রসার মুখার্জির আন্দোলন তথা অনশনের হুমকির ফলশ্রুতিতে কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও করিমগঞ্জ বিপুল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা হওয়া স্বত্ত্বেও পূর্ব বাংলার

সাথে সংযুক্ত হয়নি। তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রিমিয়ার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন কলিকাতা এবং উপরে উল্লেখ করা অঞ্চলগুলো নিয়ে পূর্ব বাংলায় যোগ দিতে চাইলেন তখন মুসলীম লীগ হাই কম্যান্ড তাকে বাদ দিয়ে বঙ্গীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা তবে তাদের অনুগত খাজা নাজিমউদ্দিনকে পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হিসেবে চয়ন করেন।

৩.৭ সরকার ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে পৃথকীকরণ

পৃথিবীর দুটো বৃহত্তম গণতন্ত্র তথা ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় প্রধান ও সরকার প্রধানকে 'ওয়ানম্যান ওয়ান পজিশন' নীতিতে আলাদা করা আছে। ভারতে ১৯৬০ এর দশকে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পরামর্শ অনুসারে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করুণাস্বামী কামরাজ নাদার (মাদ্রাজ), সেচমন্ত্রী মহারাষ্ট্রের এস. কে. পাতিল ও পশ্চিম বাংলার প্রতাপশালী নেতা অত্যুল্য ঘোষসহ ছয়জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীকে সরকার থেকে পদত্যাগ করিয়ে কামরাজ প্ল্যানের অধীনে দলীয় কর্মকান্ডে ন্যস্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে শুরু থেকে প্রেসিডেন্সী ও দলীয় প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। তবে যুক্তরাজ্যে দলীয় প্রধানই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা ও জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক পরামর্শ এমনকি গণভোট আয়োজন করা যেতে পারে। তবে টার্ম লিমিটেশন বিভিন্ন দেশে চালু থাকলেও তা গণতান্ত্রিক স্পিরিটের পরিপন্থী।

ঘ. একটি শক্তিমান, গতিময়, নিরপেক্ষ, ন্যায্য এবং আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালুকরণঃ

৪.১ একটি দক্ষ, মেধাবী ও আধুনিকমনস্ক প্রশাসন ব্যবস্থা

স্বাধীনতার মর্মবাণী তথা সমতা, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সূচনা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই একটি স্থায়ী ও আধুনিক শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন। অবশ্যই মেধাভিত্তিক একটি চাকুরী প্রদান নীতি, আধুনিক প্রশিক্ষণ, নিরপেক্ষভাবে পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলী এবং ন্যায়নিষ্ঠভাবে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করার একটি প্রত্যাশিত ব্যবস্থার পরিবেশ ও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সরকারী কর্মকর্তাগণের নিজস্ব ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত যেন তাদের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ প্রদানের প্রক্রিয়াকে আচ্ছন্ন না করে। অনুরূপভাবে ভিন্ন মতাবলম্বী চাকুরেদের নানাভাবে নাজেহাল করা বা

পদোন্নতি এবং উত্তম পদায়নে বঞ্চিত করা রুখতে হবে। রাজনীতি চিরন্তন তবে রাজনীতিবিদের পরিবর্তন স্বাভাবিক। তাই স্বাধীনতার মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়নিষ্ঠতা এবং নৈতিকতার নিরিখে দেশ পরিচালনায় আমলাতন্ত্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও ধারাবাহিকতা অপরিহার্য।

৪.২ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ

ঢাকায় বসে আঠারো কোটি মানুষের জন্য সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত সেবা দক্ষতার সাথে প্রদান করা সম্ভব হবে না। যেহেতু প্রদেশ করা যাচ্ছে না, বিভাগীয় অথবা জেলা প্রশাসনকে ক্ষমতায়িত করে অর্থ ও সম্পদ বরাদ্দসহ কার্যক্রমের যথাসম্ভব স্থানান্তর করার চিন্তা করা যেতে পারে। সত্যিকারভাবে স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছরেও বাংলাদেশের প্রশাসনে যুগোপযোগী কোন আমূল পরিবর্তন আসেনি। একটি উচ্চ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন কমিশন (একজনের কমিশন হলেও আপত্তি নেই) এমনকি একজন নিরপেক্ষ সিদ্ধহস্ত বিদেশীকে দিয়ে একটি আধুনিক অর্গানোগ্রাম এবং যুক্তিযুক্ত মানবসম্পদ নিয়োজন ও পারস্পরিকতা সৃষ্টি বিবেচনা করা যেতে পারে। জেলা পর্যায়কে যদি বিকেন্দ্রীকৃত শক্তিবলয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাহলে জেলা প্রশাসককে কি পুরোনো দিনের মতো আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সমন্বয়ের সকল ক্ষমতা দেওয়া হবে! পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল অনুসারে জেলা কমিশনার কি পুলিশ সুপারের বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট লিখবেন? তবে অর্থবহ বিকেন্দ্রীকরণের স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাজেটের অর্ধেক উপজেলাগুলোর মাধ্যমে নিয়োজন করা যায়। ফর্মূলা ঃ অর্ধেক সমানভাবে প্রতি উপজেলায় আর বাকী অর্ধেক জনসংখ্যার অনুপাতে। স্থানীয় পর্যায়ে আহরণ করা রাজস্ব কেন্দ্রে যাবে কি-না তাও বিচার্য।

৪.৩ ঢাকা মেট্রোপলিটন সরকার (ডিএমএ)

রাজধানী এখন দুই কোটি লোকের বসবাসে ভারাক্রান্ত। সেবার পরিধি সেভাবে বাড়ানো সম্ভব হয়নি। তবুও মানুষ ঢাকায় আসছে গ্রামগঞ্জ থেকে। দেশে বার্ষিক জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি যেখানে শতকরা ১.৩ ভাগ, রাজধানীর জনসংখ্যা সেখানে শতকরা ৪ ভাগ হারে বাড়ছে। রাজধানীর নানান সুযোগ সুবিধা বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে চাকরীর সুবিধা একটি চুম্বক আকর্ষণ (পুল ফ্যাক্টর) সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে আইন শৃঙ্খলার অবনতি,

স্বাস্থ্য সেবার ঘাটতি, শিক্ষা সেবার পিছিয়ে পড়া মান, কৃষি ও তদসম্পর্কিত কর্মকান্ডে বর্তমান প্রজন্মের বিপুল অনীহা এবং গ্রামবাংলায় জমির উচ্চমুল্য নতুন করে বহু মানুষকে মহানগরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে (পুশ ফ্যাক্টর)। এমতাবস্থায় দীর্ঘদিন থেকে আলোকিত সাভার, গাজীপুর, কেরানীগঞ্জ ও নরসিংদীর শহরতলীর চতুষ্টয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে গড়ে তোলার সুপারিশ করছি। ঢাকাকে দিল্লী এবং অন্যান্য নগর ইউনিট তথা একটি প্রদেশতুল্য ঢাকা মেট্রোপলিটন অথরিটি (ডিএমএ) হিসেবে গড়ে তোলার যে প্রস্তাব আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পর পর দুজন মেয়র উত্থাপন করেছিলেন সে সম্পর্কেও অগ্রাধিকারমূলক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। সমন্বয়বিহীন সেবাখাত সমূহে প্রচুর দিরুক্তি ও অপচয় ঘটে। সমন্বয়ের শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে ডিএমএ এর হাতে দিলে সকল অপচয় কমিয়ে আনবে। ডিএমএ প্রশাসনে ওয়ান পয়েন্ট সিদ্ধান্ত সেবা কেন্দ্রের হাতে যদি বিদ্যুৎ ও গ্যাসের একটা অংশ বরাদ্দ দেবার ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় তাহলে শিল্প ইউনিট স্থাপনে বৃহত্তর গতি আনা যাবে স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ বাড়বে। শহরতলীগুলো থেকে দ্রুতগামী কমিউটার রেল যোগযোগ করা গেলে বহু কর্মজীবী দৈনিক যাতায়াতে ঢাকায় যাতায়াত করতে পারবেন। ইন মাইগ্রেশন অবশ্যই কমবে। এক বছরের নোটিশ দিয়ে গৃহস্থালীতে পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। অন্য সকল দেশের মত গ্যাস সাপ্লাই সিলিন্ডারে হবে।

৪.৪ নগরসেবার পুনর্বিন্যাস মাধ্যমে ট্রাফিক সেবার ভীড়াভীড়ি হ্রাস

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক স্কুল ভর্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে যানবাহনের ভীড় হ্রাস করে।আমাদের দেশে যদি সেভাবে ভর্তি করা হয় এবং স্কুলে ব্যক্তিগত যানবাহনে আসার নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহলে যান চলাচলে স্বস্তি আনা ছাড়াও ছেলে মেয়েদের সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি পেয়ে সম্প্রীতি সৃষ্টি করবে। এর সাথে যদি বাধ্যতামূলক স্কুল ইউনিফর্ম চালু করা হয় তাহলে আয় সম্পদের বৈষম্যজনিত ভেদাভেদ কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলাকাভিত্তিক ভর্তির বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলোতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার অগ্রগতি সাধন করে আসছে।

জেব্রা ক্রসিং সৃষ্টি করে পথচারীগণের যত্রতত্র রাস্তা পারাপার বন্ধ করা যেতে পারে। প্রথম প্রথম একটি তালাবদ্ধ বাক্সে নিয়ম ভঙ্গকারীগণের উপর বিশ টাকার জরিমানা জমা করা যেতে পারে। প্রতিবন্ধি জনগণের জন্য রেলে, বাসে, জাহাজে এবং রাস্তা পারাপাওে রিজার্ভ ব্যবস্থা প্রতিপালনে কড়াকড়ি করা যেতে পারে। দেশের প্রতিটি ভবনে ভূমিকম্প প্রতিরোধক ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা জরুরী।

৪.৫ আরও বিকেন্দ্রীকরণ

সরকারী অফিস আদালত, ব্যাংক বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্লেক্সি লোডের সতর্ক সমন্বিত প্রয়োগ ট্রাফিক জ্রাম হ্রাসে সহায়ক হবে। কমাতে পারে পলিউশনও। অনেকগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান কিন্তু ঢাকার বাইরে স্থানান্তর করা সম্ভব। বাংলাদেশ রেলওয়ে দস্তুরমতো ঈশ্বরদী বা সিরাগঞ্জে হেডঅফিস স্থানান্তর করতে পারে। বাংলাদেশ নেভি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চট্টগ্রামে সরিয়ে নিতে বাঁধা দেখি না। টি-বোর্ড শ্রীমঙ্গলে যেতে পারে। স্থানীয় সরকার কুমিল্লায়, কৃষি মন্ত্রণালয় রাজশাহীতে, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ময়মনসিংহে, শিল্প মন্ত্রণালয় যশোহরে এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয় খুলনায় স্থানান্তরের কথা ভাবাই যায়। বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিন্ন ভিন্ন জেলা সদরে যেতে পারে। ইন্টারনেটের বিপুল অগ্রগতির প্রেক্ষিতে ঢাকা থেকে এ সকল সরকারী মন্ত্রণালয় ও অফিস অফিস স্থানান্তরে তেমন কোন অসুবিধা সৃষ্টি করবে না। খেয়াল রাখতে হবে যেন এখনকার মতো বড় বড় শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ যুগের পর যুগ ঢাকায় চাকরী করতে না পারেন।

কয়েকটি দেশে মেধাবী ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে বিরত থাকতে এবং গবেষণা কাজে নিয়োজিত থাকতে মুল বেতন তিন চার গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে প্রতিবেশী দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে রোগীগণ কেবল স্বল্প সংখ্যাক ডাক্তার বিশেষজ্ঞের কাছে কেন ভীড় জমান এবং তারা কেন যত্ন দিতে পারা রোগীর চেয়ে অনেক বেশী রোগী দেখেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা জরুরী। বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে বাংলাদেশের চিকিৎসা খুব উন্নত হলেও নার্সিং এবং সার্জারি পরবর্তী সেবার মান ভাল নয়।

কারওয়ান বাজার এবং অন্যান্য বড় পাইকারী বাজারে বহুতল ভবনাদি নির্মাণ করে খুচরা দোকানীগণকে ফুটপাথ থেকে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

৪.৬ কর্ম সপ্তাহ

উলামায়ে কেরামগণ সম্মতি দিলে সপ্তাহে সাড়ে চার দিন যথা সোমবার- বৃহস্পতিবার ৮.৩০ থেকে ৪.৩০ (মাঝখানে আধাঘন্টার যোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি) ৩০-০২=২৮ ঘন্টা + শুক্রবার ৮-১২ অর্থাৎ ৪ ঘন্টা মিলিয়ে ৩২ ঘন্টার কর্মঘন্টা চালু করা হলে নিম্ন বেতনভূক অনেকেই অন্য কোন কাজ করতে পারবেন। বিকল্প হিসেবে (সোম-বৃহঃ) কর্ম সপ্তাহ চারদিনের (৮-৪.৩০ আধাঘন্টার বিরতি) × ৪= ৩২ ঘন্টার কর্মসপ্তাহ করা যেতে পারে। এতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ কমবে। পল্যুশন ও কমতে পারে। উভয় বিকল্পেই রবিবার বন্ধ থাকাতে বিশেষ করে পশ্চিমা দুনিয়ার সাথে লেনদেন সহজতর হবে।

৪.৭ জনবল জরিপ ও সুষ্ঠু পদায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশেষ করে প্রশাসনে উচ্চতর পর্যায়ে পদসংখ্যার চেয়ে পদায়িতজনের সংখ্যা তিন চার গুণ হয়ে আছে। এমনও দেখা গেছে যে এজন অতিরিক্ত সচিবের অধীনে তিন জন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত। আবার একটি সম্প্রতি দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পদোন্নতি দেওয়া একজন সচিবের তুলনায় কয়েক বছরের প্রবীন, সুনামধারী ও দক্ষ অতিরিক্ত সচিব কর্মরত রয়েছেন। বিগত কয়েক বছরে এ অব্যবস্থা নিয়ে মন কষাকষি, কথিত উৎকোচের সংবাদ ও সেবার মানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এক বছর আনুষ্ঠানিক পদোন্নতি বন্ধ রেখে উচ্চ পদের সংখ্যা অতিরিক্তগণকে তাৎক্ষণিকভাবে পদোন্নতি দিয়ে অবসরে পাঠানোর কথা ভাবে যেতে পারে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকেক অধীনস্ত কর্পোরেশন বা অধিদপ্তরের কাজ করতে দেওয়া সঠিক নয়। প্রেষণে বিশেষায়িত কাজের শীর্ষপদে অন্য ক্যাডারের লোক বসানো একদম ঠিক নয়। উচ্চপদস্থগণের অনেকেই নাকি ব্যাংক বীমা কর্পোরেশন ও বহুজাতিক সংস্থায় একাধিক কাজে নিয়োজিত থেকে কর্মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন।

৪.৮ নিয়োগ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ কর্ম কমিশন উচ্চপদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু ভালো উদ্যোগ নিলেও গাড়ীচালক শতকোটি টাকার মালিক আইয়ুব আলী মারফতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে থাকে বলে অভিযোগ। আবার লিখিত পরীক্ষায় হা না কুইজ থাকার ফলে মেধার বদলে ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে থাকে এবং এতে অসাধু উপায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

শিক্ষার মানের কথিত অবনতি নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হলেও আজকের শীর্ষস্থানীয় মেধাবীগণ বিগত দিনের শীর্ষস্থানীয় মেধাবীগণের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার বলেই মনে হয়। সম্প্রতিকালে সরকারী চাকুরীর বেতনাদি, সুযোগ-সুবিধা, ও অবসরভাতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মেধাবীগণের একটি বড় অংশ সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। তবে বিসিএস (প্রশাসন) এর তুলনায় বিসিএস (পুলিশ), বিসিএস (কাস্টমস) বা বিসিএস (ট্যাক্সেশন) ক্যাডারগুলোর প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ দুর্নীতির সম্ভাবনা সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে বৈকি। আবার কৃষি, মৎস্যপালন, বন ও পরিবেশ এলাকাগুলো আগামী দিনের দ্রুত এবং সুষম প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে বলে সেদিকেও নিয়োগপ্রত্যাশীগণকে আকৃষ্ট করতে হবে।

বাংলাদেশের সকল নাগরিকের চাকরী ক্ষেত্রে সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে আমাদের সংবিধান (প্যারা ২০)। তাই রাজনৈতিক মতামত বা ধর্ম বর্ণ গোত্রের অংশী বলে মেধায় উত্তীর্ণ কাউকে চাকরী পাওয়া থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে সাধারণতঃ বাদ দেওয়া যাবে না। তবে স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণকারীগণকে অবশ্যই প্রচলিত আইনে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিচারাধীন করা যাবে।

৪.৯ সিনিয়র সুরিরিয়র পুল

দক্ষতা ও ন্যায় নিষ্ঠতার স্বার্থে যুগ্মসচিব পর্যায়ে একটি সিনিয়র সার্ভিস পুল গঠন করা যেতে পারে। জাতীয় বেতন স্কেলের ৫ম ও ৪র্থত গ্রেডের সকল কর্মকর্তা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উদ্যোগে একটি পরীক্ষা মাধ্যমে এই পুলে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন।

৪.১০ সরকারী চাকুরেগণের বাসস্থান এবং নগর উন্নয়ন

পুরাতন রেলষ্টেশন থেকে সদরঘাট পর্যন্ত এলাকাব্যাপী চল্লিশ হাজার বিশতলা ভবন ফিফটি ফিফটি ভিত্তিতে আবাসন কোম্পানীর মাধ্যমে নির্মাণ করা যেতে পারে। ফলে মানবেতর জীবনধারী বসবাসকারীগণকে ২ লক্ষ এবং সরকারী কর্মকর্তা কর্মাচারীগণকে ২ লক্ষ ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া যায়। এতে আবাসন খাতও চাঙ্গা হয়ে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে বাড়তি শক্তি যোগ করবে। প্রস্তাবিত নগরাঙ্গনে খেলার মাঠ, উপসনালয়, বিনোদন ও সংস্কৃতি কেন্দ্র থাকবে। সর্বনাশা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিগুলোকে বহুদূরে কোণে সরিয়ে নেওয়া যাবে।

৬. ব্যাংকিং সংস্কার কেন জরুরী

৫.১ কিছু তথ্য উপাত্ত ফিরে দেখা

২০০১ সনে একটি ব্যাংক ঋণ ৯০ দিনে পরিশোধ না হলে তাকে খেলাপী বলে সংজ্ঞায়িত করা হতো। এখন তাতে ৩৬৫ দিন পুরো এক বছরের সুযোগ দেওয়া হয়। তখন এক পরিবার থেকে দু'জনের বেশী বেসরকারী ব্যাংকের পরিচালক হতে পারতেন না, এখন পারেন চারজন। বেসরকারী ব্যাংক পরিচালকের মেয়াদ ছিল চার বছর, এখন বারো বছর। খেলাপী ঋণ পুনঃতফশীলে ২০০১ সনে শতকরা দশ ভাগ অগ্রীম পরিশোধ করতে হতো; এখন বড় খেলাপীদের ক্ষেত্রে জমা দিতে হয় মাত্র খেলাপী ঋণের শতকরা ০১ (এক) ভাগ। আগে দ্বিতীয়বার পুনঃতফশীল করতে শতকরা বিশ ভাগ অগ্রীম দিতে হতো। এখন শতকরা এক ভাগেই চলে। দুবারের বেশী পুনঃতফশীল করতে বড় ধরণের যৌক্তিকতা প্রয়োজনক হতো এখন যে কতবার বৃহৎ খেলাপীদের ঋণ পুনঃতফশীল হয় তা বোঝা মুশকিল। তাতে যা হবার তাই হয়েছে ১৯৯৬ সনে ঋণ খেলাপীর পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার কোটি টাকা; পাঁচ বছরে অর্থাৎ ২০০১ সনে তা শতকরা বিশ ভাগ কমিয়ে চার হাজার কোটি টাকাতে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় ইস্পাতকঠিন এবং দলমত নির্বিশেষে ন্যায়নিষ্ঠ স্বচ্ছতা নিপেক্ষেতার সাথে। খেলাপী ঋণ ২০০৬ সনে বেড়ে দাঁড়ায় ৯ (নয়) হাজার কোটি টাকা যা ২০০৯ সনে বেড়ে যায় ২২ (বাইশ) হাজার কোটিতে। বর্তমানে খেলাপী ঋণ মোট ঋণের শতকরা ৩৬ ভাগ তথা ৬ (ছয়) লক্ষ কোটি টাকার উপরে। এর ফলে অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে কতিপয় হাতে। বেড়েছে আয় সম্পদ ও সুযোগ বৈষম্য। অর্থনীতি সে কারণে কিছুটা হলেও গতিহারা হয়েছে, রাজস্ব ঃ জিডিপি অনুপাত নেমেছে আট (৮) এর ঘরে। বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ সর্বনিম্ন ৬.৭ ভাগে নেমেছে। এসবের মূল কারণ, যারাই ব্যবসায়ী বিনিয়োগকারী তাদের অনেকেই ব্যাংক মালিক ও বটেন। এই অশুভ সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব, উচিৎ এবং জরুরী। প্রয়োজন রাজনৈতিক কৃতসংকল্পতা এবং জাতীয় সদিচ্ছা। তবে সুদ মওকুফ করে দেবার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অবিলম্বে বন্ধ করা কাম্য। বলা বাহুল্য বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ব্যাংকিং খাতের অসামান্য অবদানকে খাটো করে দেখার উপায় নেই।

চ. কেন দশ বছরে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি হতে পারে!

গণতান্ত্রিক সমতাপ্রবণ ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

৬.১ কিছু তুলনামূলক চিত্র

১৯৭২ সনে বাংলাদেশের ১০ (দশ) বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি জিডিপি এখন ৫০৭ বিলিয়ন অর্থাৎ হাফ ট্রিলিয়ন পেরিয়ে। মাথাপিছু আয় ছিল ১০০ মার্কিন ডলার; এখন তা ২৮৬০। গড় আয়ু ছিল ৪৩ বছর এখন তা ৭২.৭। শিক্ষার হার ছিল শতকরা ২৭ ভাগ, এখন তা ৬০ (ষাট) ভাগের বেশী তবে মানের ব্যাপারটি বিপুলভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৩৩% এর তুলনায় এখন ১.৩%। শতকরা ৯৩ ভাগ লোক ব্যবহার করছেন পাকা পায়খানা। ১৯৭২ সনে ১ (এক) কোটি টন খাদ্য উৎপাদন হয়েছিল, এখন হয় ৪ (চার) কোটি টনের উপরে। সুপেয় জলের মাছ ও সবজি উৎপাদনে এখন বাংলাদেশ শীর্ষস্থানীয়ের দিকে। ১৯৭২ সনে দারিদ্রসীমার নীচে ৮০ (আশি) ভাগ লোকের বসবাস ছিল; এখন সাম্প্রতিক বৃদ্ধির পরেও তা শতকরা ২৭ ভাগ। বাংলাদেশ জনসংখ্যার বিবেচনায় পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম দেশ; এখানে রেমিটেন্স আসে ৫ম (পঞ্চম) সর্বোচ্চ। ১৯৭২ সনের ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানী এখন ৫৫ বিলিয়ন ডলার। অগ্রগতি চলমান। সম্ভাবনা বিপুলতর।

৬.২ তুলনামূলক অর্জন

আমাদের স্বাধীনতা লগ্নে জনসংখ্যা ছিল ৭.৫ (সাড়ে সাত) কোটি আর পাকিস্তানে ৮.৫ (সাড়ে আট) কোটি। পাকিস্তানের জিডিপি বাংলাদেশের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বেশী ছিল। এখন বাংলাদেশের জিডিপি পাকিস্তানের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ বেশী। দ্য ইকনোমিস্ট এর মতে ২০১৭ সনেই বাংলাদেশ টপকে যায় পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়কে। আইএমএফ বলছে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ভারতের চেয়ে বেশী। তবে পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটির ভিত্তিতে হিসাব করলে বাংলাদেশে মাথাপিছু জিডিপি ৮৬৭০ ডলার, ভারতে ৯১৮০ ডলার ও পাকিস্তানে ৬৭৭০ ডলার। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে আয়, সম্পদ ও সুযোগ বৈষম্য বিরাজমান। বাংলাদেশে শীর্ষ ০১ (এক) ভাগ লোকের হাতে ১৬.৩ থেকে ২৩ ভাগ জাতীয় আয় রয়েছে, ভারতবর্ষে শীর্ষ ০১ (এক) ভাগ মানুষের হাতে ২২.৫ (সাড়ে বাইশ) ভাগ জাতীয় আয় রয়েছে। পাকিস্তানে শীর্ষ ০১ (এক) ভাগ মানুষের হাতে রয়েছে জাতীয় আয়ের শতকরা ২১ ভাগ।

৬.৩ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি

জন্মের প্রথম দু'বছর ছাড়া বাংলাদেশের সমষ্টিক আয়ে প্রবৃদ্ধি একমুখী কেবলই ইতিবাচক। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে ঃ স্বাধীনতা প্রসূত সমৃদ্ধির সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছেন যারা সেই শিল্পপতি-ব্যবসায়ী-ব্যাংক মালিকগণকে কর প্রদানের যৌক্তিকতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে কর রাজস্বে বিপুল প্রবৃদ্ধি আনা যাতে ২০২৬-২৭ সনের বাজেটে উল্লেখ করা বিনিয়োগ ঃ জিডিপি হার শতকরা ৪০ ভাগে উন্নীত করা যায়। তাছাড়া ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও (আইকোর) যা এককালে ৪ (চার) এর নীচে ছিল কিন্তু ২০২৪-২৫ সনে ৬.৪ এ উঠে যায় এবং ২০২৫-২৬ এ ৫.৪ এ উন্নীত হয়। এটিকে আগের অবস্থানে অর্থাৎ আইকোর কে ৪ বা তার কিছু উপরে উন্নীত করতে হলে (১) আইন শৃঙ্খলার উন্নতি, (২) যোগাযোগে বিপুল অগ্রগতি, যেমন রেলের ব্রডগেজে ডাবল লাইনে ব্যাপক প্রসার (৩) প্রশাসনিক দক্ষতা ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, (৪) সবচেয়ে বড় কথা সর্বনাশা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমাতে কৃষি উৎপাদন ও বিপননে সমবায়, (৫) নগর অঞ্চলে ট্রাক মাধ্যমে নিত্য ব্যবহার্যের বিক্রি বহুগুণে বৃদ্ধি করা (ফ্যামিলি কার্ড এখানে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব), (৬) আমদানীকারকগণকে বাজার শৃঙ্খলায় আনা এবং (৭) বিদ্যমান অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। ১৯৮৩ সনে শুরু করা কর প্রশাসনের অটোমেশনে আর কত দেরী হবে!

বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি সাংবিধানিক পদ হিসাবে উন্নীত করে গভর্নরের পদটিকে ছয় বছরের এক মেয়াদী করা সুপারিশ করছি।

আমি মরহুম নেহরীন খানের মতোই আশাবাদী ঃ মানবিক মূল্যবোধ ও সহৃদয় সম্প্রীতির ন্যায়নিষ্ঠ ও সমতাধর্মী বন্টন এবং মমত্ববোধ দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে জাতিসংঘের সাস্টেনেইবল ডেভেলপমেন্ট গোলস্, এসডিজির উল্লেখযোগ্য বার্তা "লীভ নোবডি বিহাইন্ড" প্রত্যয়ে একটি গণতান্ত্রিক ও সমতাপ্রবণ সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। প্রয়োজন সকলেরত ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।